পঞ্চ নিষ্ঠা

ভারতীয় জনতা পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ

৬, মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

১৯৫২ সালে কানপুরে ভারতীয় জনসঙেঘর প্রথম অধিবেশনে জনসঙেঘর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন—

'আমি প্রথমেই স্পষ্ট করতে চাই ভারতীয় জনসঙেঘর প্রতিষ্ঠা কেবল মাত্র আগামী দিনে ভোট লড়ার জন্য হয় নি, সন্দেহ নেই যে নির্বাচনের গু(ত্ব অপরিসীম এবং যতবেশী সম্ভব নির্বাচনে আমরা বেশী সংখ্যক প্রার্থী দেবার ব্যবস্থা করব। 'নির্বাচন' আমাদের বিচার ধারাকে জনতার নিকট পৌঁছে দেবার এবং আমাদের সংগঠনকে আখিল ভারতীয় রূপ দেবার এক গু(ত্বপূর্ণ মাধ্যম যার সাহায্যে আমরা আমাদের ল(্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাব।

ভোটের ফলাফল যাই হোক না কেন, আমাদের সংগঠন তারপরেও নিরন্তর কার্যশীল থাকবে এবং সমাজের সমস্ত স্তরে আশা ও সদ্ভাবনার বার্তা বহন করবে। আমরা চেষ্টা করব নিজেদের (মতায় সুখী সমৃদ্ধশালী ও স্বাধীন ভারতে নির্মাণ করার যে ল(্য আজও জনসঙেঘর উত্তরসুরী ভারতীয় জনতা পার্টি গৌরবের সাথে বহন করছে।

'পঞ্চ প্রতিশ্রুতি' ছোট্ট এই পুস্তকের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ, অর্থ নীতি, বিদেশ নীতি, রাষ্ট্রনীতি ব্যক্ত(করার চেষ্টা হয়েছে। এ যেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে জানার এক পকেট বুক।

এই বই পড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিস্তারিত জানার আগ্রহ তৈরী হলেই এই বইটি লেখার পরিশ্রম সার্থক হবে।

প্রকাশক

প্রকাশক ঃ

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

৬, মুরলীধর সেন লেন

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশকাল ঃ

পঞ্চম সংস্কার ঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক ঃ

নিউ ভারতী প্রেস

বিধান সরণী

কলকাতা - ৬

সহযোগ রাশি ঃ কুড়ি টাকা মাত্রা

বি. জে. পি

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি

গণতন্ত্র

প্রকৃত সম্প্রদায় নিরপে(তা (সর্বধর্মসমভাব)

বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি

নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে। এর মাঝে বি.জে.পি-র রাজনৈতিক দর্শন নিঃসন্দেহে অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন। ভারতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বি.জে.পি-র রাজনৈতিক দর্শনই একমাত্র পথ। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া ধনতন্ত্রের দোষত্রুটিগুলি সম্পর্কে সজাগ। পুঁজির সন্নিবেশের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক (মতা কেন্দ্রীভূত ও একচেটিয়া রূপ ধারণ করে শোষন-প্রবণতার জন্ম দেয়। তাই অবাধ ধনতন্ত্র মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ হতে পারে না। এদিকে সমাজবাদী দুনিয়ার পতনের সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেছে যে মানুষের অধিকার হরণ করতে করতে এক সময়ে সমাজবাদ সমাজেরই শত্রু হয়ে ওঠে। সমাজবাদ শোষণ বন্ধ করতে পারেনি, শোষণ বৃদ্ধি করেছে মাত্র। সমাজবাদের প্রধানরা মানুষের মৌলিক চাহিদাও মেটান নি আবার তার অন্তরের (ুধার নিরসনও করতে পারেন নি। তাই ধনতন্ত্র অথবা সমাজ বাদ নয়, মানব মুক্তি(র পথ নির্দেশ করা আছে তৃতীয় এক পথে-যার নাম একাত্ম মানববাদ। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় রচিত একাত্ম মানবতা বাদ ছাড়া ভারতবর্ষের তথা বি(েমানবতার পরিত্রাণের পথ নেই। এই একত্মা মানববাদের দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে পঞ্চ প্রতিশ্রুতি যা বি.জে.পি-র রাজনৈতিক মূলমন্ত্র। প্রত্যেক বি.জে.পি কর্মী তথা সদস্য এই পঞ্চ প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই পঞ্চ প্রতিশ্রুতি কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা কতটা জ(রী এই নিবন্ধে তা সং(পে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি

জাতীয়তাবাদ থেকেই জাতীয় সংহতির সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সময়ে যে জাতীয়তাবাদী ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শুধু কেমন করে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটবে সেই চিন্তাই করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের জাতীয়বাদ কিসের ভিত্তিতে তৈরী হবে, সে সম্পর্কে কোন বিশেষ চিন্তা করা হয়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে

জাতীয়তাবাদের কী স্থান হবে সে বিষয়েও কোনও বিশদ চিন্তা করার অবকাশ সে সময়ে ছিল না। ফলে কেবল ভারতমাতার মুক্তি(র জন্য যে জাতীয় চেতনা গড়ে তোলা দরকার ছিল, জাতীয়তাবাদ কেবল তাতেই আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর যে শাসক গোষ্ঠীর হাতে ভারতের শাসন ভার ছিল, তাদের সংস্কৃতি ও শি(াদী(া মারাত্মকভাবে বিদেশ নির্ভর হবার ফলে স্বাধীন ভারতেও সঠিক জাতীয়তাবাদের চেতনা তৈরী করা হয়নি। বিভিন্ন বিদেশী মতবাদ এবং পরী(া-শীল মতবাদকে এদেশের অচেনা জমিতে স্থাপন করার বহু ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছে অথচ যে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর ভারতবর্ষের জনজীবন হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত সেই সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে ঠেলে রাখা হয়েছে। এর ফলে স্বাধীন ভারতের গণচেতনায় জাতীয়তাবাদকে স্থান দেওয়া হয় নি। তাই আজ অবধি জাতীয় চেতনা এদেশে গড়ে উঠতে পারেনি। জাতীয় চেতনার এই অভাবের ফলেই জাতীয় সংহতির সংকট দেখা দিচ্ছে। সংহতির অভাবের ফলে সারা দেশের নিপীড়িত মানুষের দাবী দাওয়া নিয়ে একযোগে কোনও আন্দোলন করা সম্ভব হয় না। ভাষা, জাতি অথবা ধর্মের নামে এক ভারতীয়কে আর একজনের থেকে আলাদা করে রাখা হয়। তার কারণ এই যে, বিভেদের মাঝে ঐক্যের সাংস্কৃতিক সূত্রটি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতবর্ষ এক, কাজেই একতাই আমাদের সম্বল, এমন কথা প্রচার করা হয়ে থাকলেও ভারতবর্ষ কোথায় এক এবং কেন এক সে বি(-ষণ প্রকাশ করা হয়নি। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছেন, ভারতের সংবিধানেই প্রথম ভুল করা হয়েছে—সেখানে বলা হয়েছে 'India is a federation of States'. দীনদয়ালজী প্র(করেছেন, যদি তাই হয় তা হলে কি ভারতমাতা কেবল বঙ্গমাতা, বিহারমাতা, তামিলমাতা প্রভৃতি বিভিন্ন মাতার সমষ্টি মাত্র? ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ সংবিধান প্রণয়ণের মাধ্যমে প্রথমেই রোপিত হয়েছিল। কা(ীর থেকে কন্যাকুমারী, মণিপুর থেকে গুজরাত এক অভিন্ন ভারতীয়ত্বের ধারায় প্রভাবিত। বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন লোকাচারের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ভারতবর্ষকে একটি জাতি হিসাবে চিহ্নি(ত করেছে। এই বিশেষ মূল্যবোধ ভারতবর্ষকে দিয়েছে এক সভ্যতা যা অন্য সভ্যতা থেকে পৃথক। এই সভ্যতা ও মূল্যবোধের পরম্পরাই ভারতীয় সংহতির মূল সূত্র। বি.জে.পি বি(াস করে যে, এই মূল সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারলেই জাতীয় বাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে। জাতীয় সংহতিকে কেবল রাজনৈতিক (-াগান হিসাবে ব্যবহার করলেই জাতীয় সংহতি আসবে না।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শাসক কংগ্রেস দল তাদের ভ্রান্তনীতি ও দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য বহুবার জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করেছে। তার ফলে আজ দেশের বিভিন্ন স্থানে

বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা (যা সাময়িকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল) আজ অবধি চালু রেখে কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে আলাদা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। ফলে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও এই রকম আন্দোলন শুরু হয়েছে। আকালী গোষ্ঠীর এক সময়ে অন্যতম দাবী ছিল ৩৭০ধারার মত পাঞ্জাবের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োগ করতে হবে। মিজোচুক্তির ফলে লালডেঙ্গার অনুরূপ দাবীও ভারতসরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। বৃটিশ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভাষা ভিত্তিক রাজ্যভাগ এবং তদ্রুপ ভাগাভাগির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে কংগ্রেস শাসককুল জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার দলীয় রাজনৈতিক সুবিধার্থে এমন বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান। তবেই দেশে সত্যিকারের সংহতি গড়ে উঠবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা আইন প্রণয়ন ভারতের সংহতির পক্ষে অনিষ্টকারক। তবুও রাজনৈতিক স্বার্থে শ্যামাপ্রসাদের সেই সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস বিদেশী শাসকদের পথে গিয়ে ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে। আজ এক জাতি, এক প্রাণ বলে হাজার চেঁচালেও কিছু হবে না—যতক্ষণ না ঐক্য বিনষ্টকারী আইনগুলির পরিবর্তন করা হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি অনৈক্যের হাওয়া আটকানো যাবে না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। অথচ সেই কুখ্যাত ৩৭০ ধারা আজও কাশ্মীরে চালু রয়েছে।

বি.জে.পি-র মতে এই ধরনের আইন প্রণয়ন বন্ধ হওয়া দরকার। দলীয় স্বার্থে জাতীয় সংহতি বিনষ্টকারী সকল পদক্ষেপকে বি.জে.পি প্রত্যাখ্যান করে। পাঞ্জাব চুক্তি, আসাম চুক্তি ও গোর্খাচুক্তি প্রভৃতি সব কটি চুক্তি রাজনৈতিক স্বার্থে তৈরী হয়েছে, জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে। সমগ্র দেশের পক্ষে এই চুক্তিগুলি অনৈক্যের বীজ বহন করে চলেছে। পাঞ্জাব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে জল বন্টন ও এলাকা ভাগ নিয়ে ম্যাথু কমিশনের ব্যর্থতা এবং চণ্ডীগড় হস্তান্তরের বিলম্ব প্রভৃতি ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে দলীয় ও ব্যক্তির রাজনৈতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াসে কংগ্রেস সরকার জাতীয় সংহতিকে বলি দিয়েছে। এই ভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার কোনও প্রয়াস তো হয়নি উপরন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করা হয়েছে।

এ অবস্থায় বি.জে.পি-র প্রতিশ্রুতি —ভারতবর্ষের জনজীবনে অনৈক্য সৃষ্টিকারী সকল আইন ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বি.জে.পি কর্মীরা লড়াই চালিয়ে যাবে। ভারতবর্ষের জনজীবনে ঐক্য স্থাপনকল্পে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়াই বি.জে.পি-র সংকল্প। এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে, কোনও প্ররোচনাতেই বি.জে.পি. এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মানবধর্মজাত যে সনাতনী জীবন ধারা ও মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, পৃথিবীর অন্যজাতি তথা সমাজ থেকে পৃথক হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং যে জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ হাজার হাজার বছর ধরে এক ভারতীয় পরম্পরা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, বি.জে.পি সেই মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শকে ধরে রাখার সামাজিক কাজে ব্রতী হবে। আজ সারা ভারতব্যাপী এক মেকি বিজাতীয় এবং সত্যভ্রষ্ট জীবনবোধের প্রচার চলেছে। স্বার্থান্বেষী একদল বিদেশী দালাল শ্রেণীর মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের সনাতন জীবনবোধকে ধ্বংস করার জন্য এই প্রচার চালানো হচ্ছে। এমন এক সভ্যতার আমদানী করা হচ্ছে যে সভ্যতা ভারতবর্ষের এক মুষ্টিমেয় সংখ্যাকে অঢেল বৈভব ও শৃঙ্খলাহীন প্রমোদের পথে ঠেলে দিয়ে ভারতের বৃহত্তর জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। শহর ও পল্লীবাসী জনসাধারণের মধ্যে এক দুস্তর মানসিক, ব্যবহারিক তথা সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি করছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বাজারকে কব্জা করার জন্য এমন এক মূলবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে যার দ্বারা ভারতীয় যুবসমাজ কখনই দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে না। আঞ্চলিক আনুগত্য অথবা ভাষা, জাতি, উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে আনুগত্য গড়ে উঠুক কিন্তু সমগ্র ভারতের প্রতি আনুগত্য যেন যুবশক্তির ভেতরে না আসে তারই প্রচেষ্টা চলছে। কমিউনিষ্টরা এ প্রয়াস শুরু করেছিল ১৯৪৫ সাল থেকে যখন তারা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে সমর্থন করে আরও এক পা এগিয়ে অধিকারী থিসিস এর মাধ্যমে প্রচার করেছিল যে ভারতে ১৬টি আলাদা আলাদা জাতি আছে এবং এদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে। তাদের দাবী অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, বাংলা, কেরল, গোর্খাল্যান্ড প্রভৃতি ১৬টি টুকরো টুকরো রাষ্ট্র নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এদেশের অনেক সৌভাগ্য যে সে সময় জিন্না ছাড়া অন্য কেউ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গী হয়নি। ফলে শুধু পাকিস্থান স্থাপনের মধ্যেই ভারত মায়ের দুর্ভাগ্য সীমিত ছিল। কমিউনিষ্টদের মত বিদেশী মদতপুষ্ট এই সব মতবাদ আজও জাতীয়বাদের মূলে কুঠারাঘাত করে দেশের যুব সমাজের মধ্যে বিজাতীয় চেতনা প্রচার করে জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করতে চাইছে। যে সভ্যতা পশ্চিমে পরিত্যাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, সেই সভ্যতার আমদানী

করার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রকৃত ভারতীয় জীবনধারা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে বি.জে.পি প্রতিশ্রুতিব্দ্ধ। যে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় হিসাবে চিহ্নি(ত করা যায়, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে সেই মূল্যবোধ ও সমাজচেতনা তথা জীবন চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে এক সংহতির মনোভাব গড়ে উঠবে। সেটাই হবে জাতীয় সংহতির মে(দণ্ড স্বরূপ।

২। গণতন্ত্র ঃ

পশ্চিমী ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও জনসচেতনার পরিণাম হিসাবে জন্মলাভ করেছে গণতন্ত্র। ফরাসী বিপ্-বের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব এবং প্রসার। এরপর একে একে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়তে শু(করেছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Government of the people, for the people and by the people'. অবশ্য পরবর্তীকালে যখন গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থের দল ও পুঁজিপতির দল সাধারণ মানুষকে শোষণ করল এবং গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে শাসন (মতায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করল, তারই প্রতিবাদে পৃথিবীতে সাম্যবাদ ও সমাজবাদের আবির্ভাব। আবার সমাজবাদ বা সাম্যবাদের মাধ্যমে শোষণ বন্ধ করতে গিয়ে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত আনা হল। তাই পৃথিবীর সমস্ত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তি(স্বাধীনতা অস্বীকৃত। রাজতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিকতার বি(দ্ধে গণতন্ত্রের আবির্ভাব। আবার গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে যে শোষণের পরিমণ্ডল গঠিত, তারই অবসান কল্পে উৎপত্তি এমন এক দর্শনের, যার নাম সাম্যবাদ ও সেখানে গণতন্ত্রকেই হত্যা করা হয়ে থাকে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের পশ্চিমদেশীয় স্বরূপ।

ভারতীয় ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের স্থান একটু অন্য প্রকার। রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ভারতে গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব হয়েছিল। পুরাণে কথিত আছে যে , প্রথম রাজপু(ষ মনু রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন প্রজাদের সমর্থনে। দেবতা ব্রহ্মার কাছে তিনি আদর্শ রাজতন্ত্রের শি(ায় শি(িত হয়ে ওঠেন। কাজেই বাহুবলে অন্য সকলকে দমন করে রাজা হবার মানসিকতা ভারতবর্ষের সনাতন চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে না। ভারতবর্ষের সনাতন চিন্তায় রাজাও তার প্রজা কর্ত্তৃক নির্বাচিত হন, তাঁর প্রজারঞ্জক রাজা-সুলভ গুণাবলীর জন্য। ভারতীয় পরম্পরায় রাজার অভিষেকের সময় পুরোহিত তাঁকে বারবার এই বলে স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রজাপালন তাঁর দায়িত্ব, সব কিছুই তাঁর অধীনস্থ কিন্তু রাজা নিজে ধর্মের অধীন। কী এই ধর্ম? নিছক একটি উপাসনা পদ্ধতি নয়। ভারতীয় সনাতন ধর্ম বলতে মানব ধর্মের চরম অভিব্যক্তি(কেই

বোঝায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ভাবধারায় প্রজা রাজার অধীন হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু রাজা নিজে মানব ধর্মের সেবক কাজেই প্রকারান্তরে রাজা তার প্রজারই সেবক।

এই চিন্তাধারার ফলে গণতন্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি স্বাভাবিক চেতনা রূপে স্থান পেয়েছে, এই চেতনার বশবর্তী হয়েই ভারতবর্ষের স্থাপনা। বিদেশী চেতনার প্রচার ও প্রসারের ফলে ইদানিং ভারতবর্ষের স্বাভাবিক চেতনা বহুলাংশে লুপ্ত হতে বসেছে। তাই আজ গণতন্ত্র শিখতে ভারতবর্ষকে ফরাসী বিপ্-বের অনুধাবন করতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এদেশের মাটিতে যখন গণতান্ত্রিক চেতনার পূর্ণ-প্রকাশ ঘটেছিল, তখন যাদের কোন সভ্য সমাজ ব্যবস্থা তৈরী হয় নি, আজ ভারতবর্ষকে তাদের কাছে থেকে গণতন্ত্রের শি(া নিতে হচ্ছে। এর কারণ বিদেশী চেতনার প্রচার ও ব্যাপক-প্রসারের ফলে বিগত হাজার বছরে আমরা আমাদের নিজেদের চেতনাকে হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের শাশ্বত সমাজ চেতনা পুন(দ্ধারের চেষ্টা করিনি।

স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক কারণে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার (ুণ্ণ করা হয়েছে। শাসক কংগ্রেস দল গণতন্ত্রকে বহুবার উপে(া করে রাজনৈতিক কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করেছে। ব্যক্তি(নির্ভর কংগ্রেস দলে কখনই গণতন্ত্রের শক্ত(কাঠামো গড়ে ওঠেনি। জওহরলাল নেহ(ের শাসনকালে একটি গণতান্ত্রিক আবরণ ছিল মাত্র, কিন্তু সব গু(ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই নেহ(ের ইচ্ছানুসারে হত। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার ঠিক পরমুহূর্তে নেহ(ের রাজনৈতিক ইচ্ছা চরিতার্থ করতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে বে-আইনী ঘোষণা করে হাজার হাজার স্বয়ংসেবককে বিনা বিচারে জেলে বন্দী করা হয়। গান্ধীহত্যার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কোনও সংশ্রব ছিল না, আজ অবধি কেউ এ ব্যাপারে কিছুই প্রমাণ করতে পারে নি। বস্তুত, গান্ধীজীর শেষ দিনগুলিতে জাতির জনক আর.এস.এস-র প্রতি অনুরক্ত(হচ্ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। সংঘের মাধ্যমে সে সময় সারা দেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল, এবং এটা তৎকালীন শাসকদের পছন্দ ছিল না। মেকলে তত্ত্বজাত চিন্তাধারার বি(দ্ধে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ তথা ভারতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা নেহ(ের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এই কারণেই গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক জওহরলাল নেহ(সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করে, স্বয়ং সেবকদের বিনাবিচারে বন্দী করে স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের প্রথম গোরস্থান রচনা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ইতিপূর্বের যেটুকু গণতান্ত্রিক আবরণ ছিল, সেটাও পরিত্যাগ করা হল। নির্লজ্জভাবে দল ও সরকারের স্বৈরাচারকে প্রকট করে তুললেন ইন্দিরা গান্ধী। চ(লজ্জার মাথা খেয়ে যেভাবে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দুই পুত্রকে রাজনীতির

প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একের পর এক পদ(প নিয়েছেন, একনায়কতন্ত্রী বিভিন্ন পদ(প গ্রহণ করেছেন, তাঁর দল বিনা প্রতিবাদে সেই সব কাজে সায় যুগিয়ে গেছেন। এর দ্বারা বারবার তাদের সুবিধাবাদী চরিত্র ও চারিত্রিক ক্লীবত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

এই অবস্থা চরমে উঠেছিল জ(রী অবস্থার সময়। যখন চারিদিক থেকে মানুষের নাগরিক অধিকার হরণ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার পদ(প নিয়েছিলেন প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী। আজও ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের নামে হত্যা অব্যাহত আছে। আজও কংগ্রেস সরকার ও দল রাজনৈতিক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এবং নির্বাচনী অসাধুতার সাহায্যে গণতন্ত্রকে প্রতিনিয়ত (ণ্ণ করে চলেছে। কংগ্রেস দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ব্যক্তি(কেন্দ্রিকতার বেনো জলে গণতন্ত্রের সলিল সমাধি ঘটেছে। যে দলের আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে বিন্দুমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত নেই সেই দল যে গণতন্ত্রে বি(াসী নয় তা সন্দেহাতীত। অতএব কংগ্রেস গণতন্ত্রকে চিরকালই একটা (-াগান হিসাবে ব্যবহার করবে, জাতীয় জীবনে কখনই প্রয়োগ করবে না এটাই স্বাভাবিক।

আর কম্যুনিষ্টরা তো গণতন্ত্রেই বি(াসী নয়। অবশ্য এদেশের কম্যুনিষ্টরা নির্বাচনী সুবিধা লাভের জন্য জনগণতান্ত্রিক বিপ-বের কথা বলতে থাকেন। যে শ্রেণীর বি(দ্ধে ওদের বিপ-ব সেই শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকারের কোনও দায়িত্ব ভারতীয় মার্কসবাদীরা নেন না। অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের গণতান্ত্রিক অধিকার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রেণীর পরিভাষাও মার্ক্সবাদীদের কাছে পরিবর্তনশীল। আজকের শ্রেণী শত্রু আগামীকাল শোষিতের দলে ভিড়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে এক চরম সুবিধাবাদী বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে এদেশের মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দলগুলি। তথকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ের নামে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয়ে পড়েছেন বেশ কিছু মানুষ, যারা সকল গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে সমাজে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন। পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট শাসনের ইতিবৃত্ত গণতন্ত্রের অবমাননার ইতিহাস রূপে চিহ্নি(ত হবে। স্টালিন-চাওসেস্কুর অত্যাচারের উত্তরাধিকার নিয়ে পশ্চিমবাংলার বাম শাসকবৃন্দ বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদকে যে ভাবে বাহুবলে দমন করার সর্বনাশা খেলায় মেতেছে তার প্রমাণ এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে, শহরে, জনপদে যত্রতত্র কমিউনিষ্টদের গণতন্ত্র বিরোধিতার সা(্য বহন করছে। পশ্চিমবাংলায় আজ গণতন্ত্র কেবল সি পি এম-এর জন্য—অন্য কারোর জন্য নয়। ২০১১ সালে কমিউনিষ্টদের পতনের পর তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে নব্য একনায়কতন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস দল।

বি.জে.পি বি(াস করে যে গণতন্ত্র ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে আবহমান কাল থেকে

অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় সমাজ চিন্তায় গণতন্ত্রের স্থান সুদৃঢ় ও অপ্রতিরোধ্য। যে সনাতন চিন্তাধারা ভারতবর্ষের বুকে জন্ম নিয়ে এবং ভারতবর্ষের সত্বাকে যুগে যুগে উজ্জীবিত করেছে, সেই চিন্তাধারা এমন একটি অবধারিত ল(্যে পৌঁছেছে যার নাম গণতন্ত্র। বি.জে.পি ভারতীয় সমাজে ও ভারতীয় রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় করা যাবে না। এই অধিকারই গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনার জন্ম দেয়। বি.জে.পি ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গণতন্ত্রের সুফল পৌঁছে দিতে চায়। এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসাবে বি.জে.পি সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প।

সবার ওপরে মানুষ সত্য—এই মতবাদ বি.জে.পি-র চিন্তাধারান্দ পথদ্রষ্টা। অতএব গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের স্বার্থেই প্রয়োজনীয়। যে সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র(মতা শুধু কতিপয় শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে নয় অথবা শাসক দলের স্বার্থে নয়, সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হয়, সেই সমাজ ব্যবস্থায় (Govt. for the people) বি.জে.পি বি(াসী। রাষ্ট্র(মতার উৎস যেমন জনসাধারণের মতানুসারে রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন তেমনি সরকারী (মতার উৎস হওয়া উচিত জনসাধারণের নির্ভীক মত প্রকাশের মাধ্যমে। বি.জে.পি-এর এই চিন্তাধারায় সঙ্গে Govt. of the people-এর মতবাদ একাত্মক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বি.জে.পি নির্বাচনী সংস্কারের দাবীর মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাধীন ও নির্ভীক মত প্রকাশের পথ নির্দেশ করেছে। যে রাষ্ট্র(মতা সাধারণ মানুষের নিরপে(মতামতের মাধ্যমে নির্ভীক ভাবে গঠিত হতে পারবে তাকেই যথাযথ জনসাধারণের সরকার আখ্যা দেওয়া যায়। অন্যথায় সরকার দলীয় সরকার অথবা ব্যক্তি(তথা গোষ্ঠীর সরকার হতে পারবে কিন্তু কখনই জনগণের সরকার হয়ে উঠবে না। বি.জে.পি এমন এক সামাজিক পরিমণ্ডল গঠনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে নিরপে(ভাবে জনসাধারণের সরকার তথা রাষ্ট্র(মতা গঠন করা সম্ভব হবে। Govt. by the people-এর তত্ত্বের সঙ্গে বি.জে.পি-র গণতান্ত্রিক চেতনার এখানেই মিল। গণতান্ত্রিক অধিকারকে বি.জে.পি. শুধুমাত্র রাজনৈতিক (ত্রেই নয়, সামাজিক ও আর্থিক (ত্রেও সফল করে তুলতে চায়। আর্থিক ও সামাজিক গণতন্ত্র ব্যতীত শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন।

৩। প্রকৃত সম্প্রদায় নিরপে(তা (সর্বধর্ম সমভাব) ঃ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বহু ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণে বি(াসী জাতির আগমন ঘটেছে। এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায় ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের মূল জীবন স্রোতের

সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কখনও বা এই সব জাতি সংমিশ্রণের ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলে গেছে। অথচ এইসব বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি কখনও তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করেনি। ভারতীয় ভাবধারায় সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা থাকার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর, যারা ভারতবর্ষে নিজেদের নতুন দেশ খুঁজে পেয়েছিল, তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে ত্যাগ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে বিগত হাজার বছর যাবৎ ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস পাশাপাশি সহাবস্থান করে আছে। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি। সম্রাট আকবরের অধীনে বহু হিন্দু সেনাপতি ও সভাসদ স্থান পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক আনুগত্যের সঙ্গে ধর্মীয় আনুগত্যের সংঘাত ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের প্রাক্কালে দেখা যায় নি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের বুকে স্থায়ী শাসন কায়েম করার জন্য ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করার কূটনৈতিক চাল হিসাবে ধর্মকে রাজনৈতিক জীবনে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। বৃটিশ দ্বারাই ভারতীয় মুসলমান, ভারতীয় খ্রীষ্টান প্রভৃতি গোষ্ঠির জন্ম হয়। মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলকে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে বৃটিশ সরকারের প্রভাব এবং জিন্না সমেত তৎকালীন অনেক মুসলীম লীগ নেতার কার্য্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা হিসাবে চিহ্নিত করার পেছনে বৃটিশ সরকারের স্বার্থ কাজ করেছে। নিজেদের গদী কায়েম রাখার তাগিদে বৃটিশ সরকারের স্বার্থ কাজ করেছে। নিজেদের গদী কায়েম রাখার তাগিদে বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতের বুকে নির্বিচারে ছড়িয়ে গেছে।

স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস দল ভারতবর্ষকে যখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে তখনও ঐ গদীর মোহই তাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ তার নামে তোষণের পথে গিয়ে কংগ্রেস দল ও সরকার ভারতবর্ষের বুকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ কে লালন পালন করে বর্দ্ধিত করেছে। মুসলীম সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়নি। আলোক প্রাপ্ত শিক্ষিত সমাজে ধর্মের ফতোয়া জারী করে যথেচ্ছাচার কায়েম রাখা কায়েম রাখা যায় না আর কংগ্রেস জানে যে মুসলীম সমাজ অশিক্ষিত থাকলে শুধু মুষ্টিমেয় ধর্মীয় নেতাদের বশে রাখতে পারলেই ভোট যুদ্ধে কংগ্রেসের জয় অবধারিত। তাই ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী করা এবং তাকে অটুট রাখার তাগিদে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ তার নামে মুসলিম সমেত সংখ্যালঘুদের তোষণ করার নীতি চালু রেখেছে। এর ফলেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িকতার কালো হাত সক্রিয় হয়েছে এবং ধর্মের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কেরালায় মুসলীম লীগকে অন্যায়ভাবে তোষণ করার প্রতিযোগিতায় কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টরা মেতে উঠেছিলেন শুধু মতা পাবার লোভে। ফৌজদারী আইনের ১২৫ ধারার

সংশোধন করা হয়েছ শুধু মৌলবাদীদের খুশী রেখে ভোট পাবার তাগিদে। হিন্দু কোড বিল প্রণয়ন করে কংগ্রেস জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল। সৈয়দ সাহাবুদ্দীনের মত কট্টরপন্থী মৌলবাদীকে জনতা দল স্থান দিয়েছে শুধু মুসলীম ভোটের স্বার্থে। এর ফলেই সৈয়দ সাহাবুদ্দীন মন্তব্য করতে পারেন ২০ শতাংশ মুসলমান ভোটারদের খুশী রাখার তাগিদেই ভারতের কোন রাজনৈতিক নেতা মুসলীম মহিলা বিলের বিরোধিতা করতে সাহস পাবে না, যদি অবশ্য তার নির্বাচনে জয়ের ইচ্ছা থাকে। দেশ থেকে কংগ্রেসের প্রায় বিদায়ের পর নরেন্দ্র মোদীর সরকারের প্রাথমিকতা ছিল, মুসলিম মহিলাদের সশক্তিকরণ। আর সেই লক্ষে সফলতা সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক তালাক-বিরোধী যুগান্তকারী রায়।

ভারতবর্ষের যে কোনও ধর্মের মানুষ মূলত হিন্দুই ছিলেন। খ্রীষ্টান বা মুসলমান যারা তাঁরাও কয়েক পুরুষ আগে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বহু ক্ষেত্রেই এই ধর্মান্তরনের কারণ মূলত তিনটি। দারিদ্র তথা বঞ্চনা ও শোষণ একটি কারণ, দ্বিতীয়ত হিন্দু সমাজের ভেতরে কট্টরপন্থার অবিচার যা এক সময়ে হিন্দু সমাজকে পথভ্রষ্ট করে তুলেছিল এবং তৃতীয়ত বিধর্মীদের দ্বারা বহু মানুষ অত্যাচারিত হয়ে ধর্মত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। যে কারণেই ধর্মান্তরণ হোক, ধর্মান্তরিত মানুষগুলি কখনই ভারতীয় সংস্কৃতি তথা পরম্পরা থেকে আলাদা হয়ে যাননি। তারা ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। এই মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যই ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎস কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের কাছেই রামায়ণ, মহাভারত এবং তার সভ্যতা ও মূল্যবোধের কাহিনী তথা সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত। রামচন্দ্র রামভক্ত হিন্দুদের কাছে দেবতার কিন্তু অন্য সকল ভারতীয়তের কাছে জাতীয় মূল্যবোধের প্রতীক। রামরাজ্য কোনও ধর্মমত ভিত্তিক অনুশাসনযুক্ত রাষ্ট্র নয় (Theocratic State)। রামরাজ্য একটি আদর্শ সমাজ। শোষণ হীন, সমতাযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় নিরিখে Theocratic State সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ব্যবস্থা।

অযোধ্যায় মন্দির ভারতীয় পরিচিতির প্রতীক। এই চিন্তা আজকের নতুন আবিষ্কার নয়। যে সময়ে বাবর পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করেছিলেন, তখনও এই মন্দির অটুট ছিল। সে যুগে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বসবাস করতেন। তখনও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে এই প্রতীক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করত। সেই জাতীয়তাবাদের প্রতীক স্তম্ভকে জনজীবন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য ও জাতীয় স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার জন্য বিদেশী বিজয়ী বাবর এই মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ স্থাপন করেন। আজ দেশের মেকী ধর্মনিরপেক্ষ তাবাদীরা জাতীয়তাবাদকে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে সংকীর্ণ ঔপচারিক

ধর্মের বাধনে আবদ্ধ করে সমাজকে বিভক্ত(রাখতে চাইছেন শুধু ভোট বাক্সের কলেবরের কথা চিন্তা করে। এরাই মুসলমানকে শেখাচ্ছে যে রামচন্দ্র হিন্দুদের দেবতা, তোমার সঙ্গে তাঁর কোন যোগসূত্র নেই। মুসলমানদের আরাধ্য তো বাবর। যেহেতু তিনি মুসলমান। এরাই কোনদিন আবার শেখাবেন যেহেতু ইয়াহিয়া খান মুসলীম ধর্মাবলম্বী তাই ভারতের মুসলমানেরও উচিত পাকিস্তানের প(নেওয়া। এই ভাবে মুসলমানকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে মুসলীম সমাজকে এরা জাতীয়তাবাদী পথে চলতে দেয় না শুধু ব্লক ভোটের স্বার্থে। ধর্মনিরপে(তার নামে এরা সমাজে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে চলেছেন।

বি.জে.পি মেকী ধর্মনিরপে(তায় বি(াসী নয়। বি.জে.পি ধর্ম সম্বন্ধে নিরপে(অথবা উদাসীন কখনও নয়। বি জে পি ধর্মে বি(াসী। কেন না ধর্মই মানষকে মানবেতর প্রাণী থেকে উৎকৃষ্ট হতে সাহায্যে করেছে। ধর্মনিরপে(তার অর্থ সম্প্রদায় নিরপে(তা বোঝায়। অতএব বি.জে.পি রাজনৈতিক দল হিসাবে ধর্ম, সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরপে(কিন্তু ধর্মবোধ, চেতনা নৈতিকতা সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নয়।

ভারতবর্ষের সনাতন পরম্পরাই ভারতের জাতীয় জীবনের মূল স্রোত স্বরূপ। সেখানে সম্প্রদায়গত বিভাজনের স্থান নেই। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই ভারতীয় এবং সেটাই ভারতবর্ষের মানুষের প্রথম ও প্রধান রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরিচয়। কাজেই যাঁরা বলেন যে আমি প্রথমে অমুক ধর্মীয় তারপর ভারতীয় বি.জে.পি-র দৃষ্টিতে তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জাতীয়তা বিরোধী।

যেহেতু জাতীয় জীবনে বি.জে.পি সম্প্রদায় নিরপে(তাই বি.জে.পি-র রাজনীতিতে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আইন প্রণয়নের স্থান নেই। আর ভোটের খাতিরে কোনও গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়কে তোষণ করা বি.জে.পি-র দৃষ্টিতে জাতীয় অপরাধ। বি.জে.পি-র ল(্য জাতীয় জীবনে সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্বের প্রকাশ ঘটুক। এই ভারতীয়ত্বের ধারা ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল, এই ভারতীয়ত্বের ধারা যুগে যুগে পরিবর্তনের অগ্নি পরী(ায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছে যে এই ধারা অমর, (াশ্বত ও কালজয়ী। সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট বি.জে.পি-র এই চিন্তাধারা। এখানে সম্প্রদায় তোষণের স্থান নেই। তেমনি কোনও সম্প্রদায়কে দলিত করার অবকাশও এখানে নেই। বি.জে.পি-র এই সাম্প্রদায়িক দোষমুক্ত(জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রয়াসকে হিন্দু পার্টি আখ্যা দিয়ে, সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নি(ত করা হোত বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার স্বার্থে এবং এর ফলে ভারতের জনজীবনে অনৈক্যের বীজ রোপণ করা হয়েছিল। তেমনি বি.জে.পি-র জাতীয়তাবাদী ও প্রকৃত সম্প্রদায়-নিরপে(রাজনীতিকে শাসক কংগ্রেস দাবিয়ে রাখতে চায়, নিজেদের গদী

অটুট রাখার স্বার্থে। তাই বি.জে.পি-র বি(দ্ধে অপপ্রচার যে, বি.জে.পি হিন্দু দল ও সাম্প্রদায়িক দল। যেভাবে বৃটিশ শাসককূল ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করে শুধু নিজের স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা প্রচার করেছিল মুসলীম লীগের মারফৎ, ঠিক একইভাবে ভোট শিকারী রাজনৈতিক দলগুলি (মতা কায়েম রাখার জন্য মৌলবাদী ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করণের পথে নিয়ে চলেছে।

বি.জে.পি-র বি(াস প্রকৃত সম্প্রদায় নিরপে(তার বাস্তবনীতি ভারতবর্ষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করবে ও সকল শ্রেণীও সম্প্রদায়ের ভারতীয়কে আকৃষ্ট করবে। যে ভ্রান্ত তথা সুবিধাবাদী ও জাতীয়তা বিরোধী নীতি ধর্মনিরপে(তার নামে কংগ্রেস কর্তৃক প্রচলিত হয়ে, বামপন্থীদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে দেশে সাম্প্রয়ায়িকতা বৃদ্ধি করেছে, সেই নীতির বি(দ্ধে বি.জে.পি-র প্রদর্শিত পথে সমগ্র দেশ প্রতিবাদে সোচ্চার হবে এবং ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে প্রকৃত সম্প্রদায় নিরপে(তার প্রতিষ্ঠা হবে।

৪। বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি

সমাজবাদ কথাটির সঙ্গে অনেকের মনেই বিদেশী ভাবধারা ফুটে ওঠে। ধনতন্ত্রের কুফলের প্রতিবাদে পাশ্চাত্য দেশে সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল যার ফলে মার্ক্স, এঞ্জেঁল্‌স্ প্রমুখ চিন্তাবিদগণ সমাজতন্ত্রের চিন্তা করেছিলেন। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের এই চিন্তা ধনতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের ফলে বিকশিত হয়নি। দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর তথা অনুন্নত শ্রেণীর সার্বিক উন্নতির জন্য ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে এদেশের অনেক মনীষীই যুগে যুগে চিন্তা করে গেছেন। গান্ধীজী স্বাধীন ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে চিন্তা করেছেন তা বি.জে.পি-র চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রণীত একাত্মমানববাদের সঙ্গেও গান্ধীজীর সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাধারা অনেকটাই সমার্থক।

পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ বিভিন্ন উপায়ে চাহিদা সৃষ্টি করা এবং উৎপাদনবৃদ্ধি করে যোগানের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থাতেই তৈরী হয় মুনাফা। এই বল্গাহীন চাহিদা সৃষ্টির কবলে পড়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলছে, যার ফলে বহু(ত্রে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য নষ্ট হতে বসেছে। অধিকতর ফসলের চাহিদা মেটাতে আমেরিকায় বড় বড় চাষ যোগ্য ভূমি অতি ব্যবহারের ফলে অনুর্বর হয়ে পড়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বেশী কাঠের প্রয়োজন। এই চাহিদার যোগান দিতে বেহিসাবী বনাঞ্চল কেটে ফেলার

ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। ভূমি(য় বাড়ছে, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এসবই ধনতান্ত্রিক প্রত্রি(য়ার কুফল। প্রকৃত মানব স্বার্থে প্রকৃতির সদ্ব্যবহার করাই সংস্কৃতি। আর মানুষের লোভ মেটানোর জন্য প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য বিনষ্ট করাই হল বিকৃতি। অবাধ ধনতন্ত্রে এই বিকৃতি আসতে বাধ্য। একাত্মমানববাদের বিস্তৃতিতে দীনদয়ালজী অবাধ ধনতন্ত্রের কুফলগুলি সম্যকরূপে দেখিয়েছেন। আবার সাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণের ফলে এবং রাষ্ট্র কেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার ফলে সাধারণ মানুষের যে স্বাভাবিক ব্যক্তি(গত উদ্যোগকে খর্ব করা হয় সে কথাও একাত্ম মানববাদের ছত্রেছত্রে উল্লিখিত আছে। অতএব ভারতবর্ষের প্রয়োজন এমন এক অর্থ ব্যবস্থা যার দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, মানব সম্পদের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক মিলন ঘটিয়ে দেশের দরিদ্রতম মানুষের উন্নতিসাধন সম্ভব হবে। গান্ধীজীও আরেকটা এই ধরনের আর্থিক ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। স্বাধীন ভারতে কখনই এই প্রকার আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নি, মিশ্র অর্থনীতির নামে আংশিক ধনতন্ত্র ও আংশিক সমাজতন্ত্রের এক জগাখিচুড়ী অর্থনীতি এদেশে প্রচলিত রয়েছে, ফলে দুটি মতবাদের ত্রুটিগুলি পূর্ণমাত্রায় এদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। ধনী আরও ধন সংগ্রহ করে বিপুল আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে সমাজে প্রভুত্ব করছে অন্যদিকে দরিদ্র মানুষ আরও বেশী করে গভীরতর দারিদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছে।

বি.জে.পি বিকেন্দ্রীকরণে বি(্বাসী। অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ থেকেই রাজনৈতিক ও সামাজিক (মতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব ও সার্থক হয়। এই অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপায় উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণ। মূল ও ভারী শিল্পের কেন্দ্রভূত উৎপাদন চলতে থাকবে কেননা এই (ে ত্রে কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন অর্থনৈতিক ভাবে সুচা(ও লাভজনক হবে। এই শিল্পকে রাষ্ট্রয়ত্ত (ে ত্রে রাখা যেতে পারে।

কিন্তু শ্রমিক প্রধান (ে ত্রে বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন হওয়া উচিত। এর ফলে কর্মসংস্থান ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ বাড়ছে। কৃষিও শিল্প(ে ত্রে নতুন বিনিয়োগ তখনই সার্থক হবে যখন এই বিনিয়োগের প্রতিটি একক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ও বেকারত্বের বিশালতার পরিপ্রে(তে এই প্রকার বিনিয়োগ নীতিই বাস্তব সম্মত। ভোগ্যপণ্য ও সেবামূলক (ে ত্রে উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে শ্রমিকমুখী হওয়া প্রয়োজন। বি.জে.পি-র বি(্বাস, এই বিশাল দেশে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বিকেন্দ্রীকৃত শ্রমিক মুখী হলে দেশ জুড়ে কর্মসংস্থানের অনেক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভারতবর্ষে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিম্নতম চাহিদার যোগান এবং ত্র(য় (মতার মধ্যে সেই চাহিদা পূরণ। চাহিদা সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে

একদিকে প্রসাধনী সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ছে এবং মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করা হচ্ছে, অন্য দিকে বিশাল জনসমষ্টির জন্য সুলভে খাদ্য, পরিধেয় অথবা বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থার অবসান কল্পে প্রয়োজন প্রকৃত চাহিদা উপযোগী উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণ এবং নিম্নতমের ত্র(ম(মতার সঙ্গে উৎপাদনের একটি সামঞ্জস্য স্থাপন।

কৃষি(ে ত্রে ফসলের বিত্র(য় মূল্য ও খাদ্যের ত্র(য় মূল্যের মাঝে বিরাট ব্যবধান দূর করতে বি.জে.পি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৃষক স্বল্প মূল্যে শস্য বিত্র(য় করেন এবং চড়াদামে খাদ্যসামগ্রী কেনেন ফলে কৃষকের দারিদ্র ঘোচে না। মাঝখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী প্রচুর লাভ করেন। বি.জে.পি এই অবস্থার অবসান চায়।

কৃষিনির্ভর শিল্পোদ্যোগকে বিকেন্দ্রীকরণ করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু শিল্পনগরীগুলিতে কৃষি নির্ভর শিল্পোদ্যোগ থাকার ফলে কৃষিজাত পণ্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থার অবসান চাই। গ্রামে গ্রামে ছোট আকারে মজুত করার জন্য গোলা অথবা গুদাম তৈরী করা প্রয়োজন। এই ভাবে সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে স্বল্প খরচে কৃষি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ,শস্য গুদাম ও স্বনির্ভর বিপনন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়বে, গ্রাম থেকে কর্ম সন্ধানে শহরে আসার ঝোঁক কমবে। এর ফলেই গ্রামের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে ও শহরের ওপর অহেতুক অর্থনৈতিক চাপ কমে আসবে এবং শহরগুলির উন্নতিও সম্ভব হবে। গ্রাম নির্ভর এই দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তখনই সম্ভব যখন অঞ্চল ও ব্লকগুলি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন লাভ করবে। বিকেন্দ্রীকরণের মূল কথা বিকেন্দ্রীকৃত স্বাবলম্বন।

ব্যক্তি(গত উদ্যোগ ও কো-অপারেটিভ (ে ত্রের প্রসার বি.জে.পি-র ল(্য। এর ফলে মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়া কমবে এবং মূলধন বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে।

বি.জে.পি উৎপাদন (ে ত্র পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণে আস্থাবান। এর ফলে শ্রমিকের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদনে শ্রমিকের একাত্মতা জন্মায় শিল্প(ে ত্রের বিনিয়োগেও শ্রমিকের অংশ গ্রহণ সুস্থ শিল্প সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হবে বলে বি.জে.পি-র বি(্বাস।

উচ্চ কারিগরী জ্ঞান দরিদ্রতম শ্রেণীর উপকারে প্রয়োগ করতে হবে। মূল ও ভারী শিল্পে এবং উচ্চ কারিগরী শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি(বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বি.জে.পি. ভারতের পণ্যকে বি(্বমানে পৌঁছে দিতে চায়। প্রযুক্তি(বিদ্যাকে মানব প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করাই বি.জে.পি-র ল(্য। কিন্তু যন্ত্রকে মানুষের বিকল্প রূপে অবাধ ব্যবহার করার প্রচেষ্টা মানব সম্পদের মান নষ্ট করে। ভারতের মত মানব সম্পদ সমৃদ্ধ দেশের প(যন্ত্রের ব্যবহার সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বি.জে.পি-র মতে প্রযুক্তি(বিদ্যা আমাদানীর

অজুহাতে উচ্চ কারিগরী যন্ত্র আমদানী করে ভারতে বেকারত্ব বৃদ্ধির নীতি জাতীয় অর্থনীতিতে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে চাহিদার (ে ত্রে স্বদেশী জাগরণ করা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলির অনুকরণ করে ভোগ্যপণ্যের বিপুল ও মেকি চাহিদা সৃষ্টি করার ফলে বেহিসাবী খরচ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উন্মাদনার ফলে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় (ে ত্রগুলিকে যথেষ্ট গু(ত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সহজ সরল জীবন ধারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেকি চাহিদা সৃষ্টির ফলে চাহিদা ও যোগানের বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হচ্ছে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

শিল্পপতিরা তাদের ত্র(মশঃ (ীয়মান যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য একটি (Depreciation Fund) বা (য়পূরণ তহবিল সৃষ্টি করেন। এমতাবস্থায় প্রকৃতির (য়পূরণ তহবিল কি ভাবে অবহেলা করা সম্ভব? এই দিক থেকে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারবো যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের (ে ত্রে অমিতব্যয়ী হলে চলবে না। যা প্রয়োজন তাই গ্রহণ করতে হবে। ঁ এ জন্য ঈ(ের আমাদের প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। কেবলমাত্র উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নি। ইঞ্জিনের কয়লা প্রয়োজন কিন্তু কেবলমাত্র কয়লা জ্বালনোই ইঞ্জিনের কাজ না। কম কয়লা ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক শক্তি(সংগ্রহই উদ্দেশ্য। সেটাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতে প্রকৃতিকে শোষণ করা হবে না-প্রকৃতির পোষণ হবে এবং নিজেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। গ(হত্যা না করে, যেমন তার দুধ পান করা উচিত— তেমনি প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে অতিরিক্ত(উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করাই আমাদের কাম্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি অর্থব্যবস্থাকে উদ্বুদ্ধ করে তবে অর্থনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন ঘটবে। পশ্চিমি দেশগুলিতে (পুঁজিবাদী বা সাম্যবাদী) মূল্যকে অর্থনীতিতে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। সকল অর্থনৈতিক চিন্তা মূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে সমাজ চিন্তা সম্পূর্ণভাবে মূল্যের উপর গড়ে ওঠে তা সম্পূর্ণ অমানবীয় এবং ন্যায় নীতি বিরোধী। একটা কথা আজকাল প্রায় শোনা যায়—ব্যক্তি(কে অন্ন অর্জন করতেই হবে। সাধারণতঃ কম্যুনিস্টরা এই (ে-াগান দেয় কিন্তু পুঁজিবাদীরা, পুঁজি ও উদ্যোগকে উৎপাদনের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেন, সেজন্য তাদের মতে লভ্যাংশের অধিক অংশ তাদের প্রাপ্য। অপর দিকে কম্যুনিষ্টরা মনে করে যে একমাত্র শ্রমই উৎপাদনের প্রধান উপাদান সুতরাং শ্রমিকদেরই বৃহত্তর অংশ প্রাপ্য। এই দুই মতবাদের কোনটিই সত্য নয়। আমাদের আদর্শ যে ব্যক্তি(উপার্জন করবে তাকে যথেষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্নের অধিকার জন্মগত। উপার্জনের শক্তি(বিদ্যাও শি(া সাপে(। সমাজে যারা উপার্জন করতে পারে না তাদেরও আহারে অধিকার আছে। কোন ব্যক্তি(শুধু

তার (টির জন্য কাজ করে না—আদর্শ পূরণের জন্য পরিশ্রম করে। না হলে যাদের আহার্য আছে তারা কাজ করতো না।

'খাদ্য বস্ত্র ও বাসগৃহ' মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। যে কোন অর্থব্যবস্থাকে এই প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তি(কে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত(শি(া সমাজকে দিতে হবে। যদি এই দেশে পোষণ ও সংর(ণের নিশ্চয়তা না থাকে তবে এই দেশের ভারত নাম অর্থহীন।

৫। নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি ঃ

ইদানিং সাধারণ মানুষ ত্র(মশঃ রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠেছে। রাজনীতিকে পরিহার করে জীবন যাপনের প্রবণতা ত্র(মশঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে বেড়ে চলেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যারা সত্রি(য় রাজনীতি করতেন সাধারণ মানুষের তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, সমাজে তারা মানী লোক হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন। আর আজ যারা সত্রি(য় রাজনীতিতে অংশ নেন সমাজে তারা অসৎ স্বার্থান্বেষী হিসাবে চিহ্নি(ত হন এবং স্বাভাবিক ভাবেই অপাংক্তে(য় হিসাবে পরিগণিত হন। এর কারণ কি?

স্বাধীনতার পর থেকেই কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠী তাদের (মতা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার তাগিদে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অপরিমেয় অসাধুতা অবলম্বন করেছেন এবং অসৎপন্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সরকারে ও দলে নেতৃত্বের গদিকে সুর(ি ত করতে অনৈতিক কার্যকলাপ পণ্ডিত নেহ(ের আমল থেকেই প্রশ্রয় দিয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যু স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক তথা সামাজিক জীবনে কংগ্রেসী নীতিহীনতার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরও আগে ১৯৪৮ সালে নেহ(ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দ্বারা সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ প্রকল্পকে অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত নেবার পরেও ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতি যখন মন্দিরের দ্বারোৎঘাটন করতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে এই কার্যসূচীর বিরোধিতা করে নেহ(একই ইস্যুতে দুমুখো নীতির পরিচয় দিয়েছেন। নেহে(নিজেও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত(সহকর্মীদের (মতাচ্যুত করেন নি সেটা তাঁর রাজনৈতিক নীতিহীনতার পরিচয় রাখে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপুল স্বর্ণ ও অর্থভাণ্ডার এবং কা(্মীরের মহারাজা হরি সিংয়ের দৌলত লুণ্ঠনের অভিযোগও আছে তাঁর বি(দ্ধে। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে (মতার রাজনীতি এমন নির্লজ্জরূপে প্রকট হয় যে সমস্ত ন্যায়নীতি ভারতীয় জনজীবন থেকে ত্র(মশঃ নির্বাসিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আমদানী হয় বিরাট টাকার খেলা—রাজনীতি ত্র(মশঃ (মতালিপ্সায় জড়িয়ে পড়ে এবং ভোট সর্বস্ব হয়ে পড়ে। যেন তেন প্রকারে ভোটে জয়লাভ রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে পড়ার ফলে কালো টাকা,

বাহুবল ও (মতাবলের কাছে রাজনীতি নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ব্যক্তি(স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বাভাবিক নীতিনিষ্ঠতাকে ব্যক্তি(তথা গোষ্ঠীস্বার্থের যূবকাষ্ঠে বলি দেবার প্রচেষ্টা, (মতার লোভে অথবা নিছক টাকার লোভে দল ভাঙা ও দলত্যাগে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় রাজনীতিতে এক অতীব কর্দয্য নীতিহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে 'আয়রাম গয়ারামে'র দল আজও জাতীয় রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসে আছে। দুর্নীতিগ্রস্থ লোকেরা জাতীয় জীবনের উচ্চতম পদে বহাল তবিয়তে অধিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় চেতনাকে বিসর্জন দিয়ে (মতার রাজনীতিতে ডুবে যাওয়া কংগ্রেস দল সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে নীতিহীনতার বীজ বপন করেছে।

ভারতবর্ষের অকমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যে বি.জে.পি ব্যতীত প্রায় অন্য সব দলই কংগ্রেস ভেঙে তৈরী হয়েছে। যেহেতু কংগ্রেসের রাজনীতিতে নীতিনিষ্ঠতার চেয়ে (মতালিপ্সার স্থান উপরে, তাই নীতিহীনতার রাজনীতি বিরোধী দলগুলির মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে।

দেবীলাল, লালু, মূলায়াম, কংগ্রেস সারা ভারতের বুকে যে নির্লজ্জ রাজনৈতিক খেলা দেখিয়েছে তারপর আর এই সব দলগুলির পরিবারতন্ত্র নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই। বোফর্স-এর ব্যাপারে রাজীব গান্ধী যে ভাবে বিরোধী দল, প্রশাসন ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, গণতন্ত্রের ইতিহাসে সে সব ঘটনা এক ন্যক্কারজনক অধ্যায়। ভোটের স্বার্থে হিন্দু-শিখ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগিয়ে রাজীব গান্ধী এবং কংগ্রেসের অন্য নেতৃবৃন্দ যেভাবে জনজীবনের (তি করে গেছেন এবং লজ্জার মাথা খেয়ে তার সাফাই গেয়েছেন তার জন্য ইতিহাস কংগ্রেসকে মার্জনা করবে না। রাজনীতিতে নীতিনিষ্ঠার প্রতীকরূপে প্রচারিত বি(্বনাথ প্রতাপ সিং ও নরসিমা রাও যেভাবে বি(্বহিন্দু পরিষদের সঙ্গে ছলনা করেছেন এবং দেবীলালকে কোণঠাসা করতে যেভাবে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়েছিলেন তার ফলে তাঁদেরমুখেও নীতিনিষ্ঠার বুলি আর মানায় না। বি(্বনাথ প্রতাপ সিংহ, চন্দ্রশেখর ও নরসিংহ রাও-এর আমলে (মতার টিকে থাকার জন্য এরা যে ভাবে সাংসদ ও বিধায়ক কেনাবেচার খেলা চালিয়ে গেছেন তারপর এদের মুখে নীতিনিষ্ঠার কথা আর মানায় না। এরা প্রমাণ করেছে যে দুর্নীতির চোরাগলিতেই এরা রাজনীতি করেন। যে ভাবে চন্দ্রশেখর প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং যেভাবে কংগ্রেস তাকে সমর্থন করেছে তার থেকে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে এরা সকলেই (মতার যূপকাষ্ঠে নীতিনিষ্ঠাকে বলি দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর। জনতা দলের কিছু নেতা যে ভাবে একদা এম. এল.এ. এম. পি অথবা মন্ত্রী হবার লোভে বামফ্রন্টে যোগদান করার আবেদন করেন

এবং বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস দলের কাছে। আত্মসমর্পণ করেন, তখন এদের রাজনৈতিক দুর্নীতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কমিউনিষ্টদের রাজনীতি হল দলীয় স্বার্থের রাজনীতি, জাতির বা দেশের স্বার্থের রাজনীতি নয়। এতএব তাত্ত্বিক বিচারে দলীয় স্বার্থ র(ার জন্য জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন করে যে কোনও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। কালো টাকার খেলা, (মতার অপব্যবহার ও বাহুবলের আশ্রয় তারা রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে। সারা দেশের রাজনীতিতে ব্যক্তি(স্বার্থের জন্য যে দুর্নীতির পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছ, ভারতীয় কমিউনিষ্টরা এর থেকে মুক্ত(নন। পশ্চিমবাংলার (মতা বজায় রাখার জন্য বামপন্থী দলগুলি সবকরম কংগ্রেসী উপকরণ গ্রহণ করেছে, সাম্প্রদায়িক তোষণের রাজনীতিতে মদত দিয়ে উপরন্তু গ্রামে গঞ্জে দুর্নীতিকে দলীয় স্বার্থে আরও ব্যাপকতর রূপে প্রসার ঘটিয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যখন বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ ভাবে বেড়ে চলেছে, দলীয় রাজনীতির চাপে কৃষিকার্য সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, শিল্প(ত্রে নাভি(্বাস উঠছে, তখনই পার্টি কর্মী এবং অনুগতদের দুর্নীতি ব্যপক হারে বেড়ে চলেছে এবং তাদের ত্র(মশঃ শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। এমন কি নেতাদের পরিবারও এর থেকে মুক্ত(নয়। এ চিত্র পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে গ্রামগঞ্জে সর্বত্র সমান। পশ্চিমবাংলার বুকে কমিউনিষ্টদের সেই নীতিহীন, মানবতাবিরোধী, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির আরও বল্যাহীন প্রকাশ ঘটছে তৃণমূল কংগ্রেস দলের রাজত্বে।

ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল। ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম মুখ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রাজনীতিতে নীতিনিষ্ঠা প্রণয়ন। সারা পৃথিবীতে রাজনৈতিক (ত্রে নীতিজ্ঞান বিলুপ্ত হতে বসেছে। মানবতার প(এটি একটি মারাত্মক (তিকারক প্রবণতা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের মানের অবনতির অন্যতম কারণ সাধারণ শি(ত মানুষের রাজনীতির প্রতি অনীহা। মধ্যবিত্ত শি(ত সমাজ যত রাজনীতি থেকে সরে যাচ্ছেন তত অসামাজিক নিম্নমানের অরাজনৈতিক কর্মী রাজনীতির আসর সাজিয়ে বসছে। এরাই দুর্নীতির বাহক-এরাই ত্র(মশঃ জনজীবনকে পরিচালিত করছে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে শি(ত মধ্যবিত্ত সমাজ চিরকাল জনজাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছে। উচ্চবিত্তরা সাধারণ ভাবে নিজ স্বার্থের গণ্ডীর বাইরে যান না আর অত্যধিক নিম্নবিত্ত সমাজ অর্থনৈতিক চাপের ফলে শোষক শ্রেণীর বজ্রমুষ্ঠি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই শি(ত মধ্যবিত্ত যুগে যুগে পরিবর্তনের পুরোভাগে থেকেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি শি(ত সমাজের কাছে আবেদন রাখছে স্বার্থান্বেষীদের সুযোগ করে দেবেন না। আগামী দিনে আপনার উত্তর পু(ষের জীবনযাত্রার মান সুর(ত করতে আজ এই নীতিহীনতার বি(দ্ধে সাধ্যানুসারে সক্রি(য় যোগদান ক(ন।

ভারতীয় জনতা পার্টি নীতি ও সিদ্ধান্তবাদী দল। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই দল গঠিত। ভারতের কোনও সংগঠনের যদি গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলি সুদৃঢ় থাকে তাহলে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির গঠনতন্ত্রেই আছে। ব্যক্তি(স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদ এই দলের সকলস্তরে বিদ্যমান। নীতিনিষ্ঠা আমাদের মূলতন্ত্র। যদিও সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামান্য হলেও বিজেপি-র কয়েকজনকে প্রভাবিত করেছে। শৃঙ্খলাভঙ্গের সামান্য দু একটা ঘটনা বিজেপি নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। সব (ে ত্রেই শৃঙ্খলামূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বি.জে.পি আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছে। বি.জে.পি নীতিজ্ঞানকে সত্যজ্ঞানে পূজা করে। তাই রাজনীতি বিজেপি-কাছে শুধু পেশা অথবা সমাজ সেবা নয়। রাজনীতি বিজেপির কাছে ধর্ম্মাচরণের সামিল। ধর্ম্মাচরণ যেমন পেশায় পরিণত হলে ধর্মের নামে ব্যবসা হয় তেমনি রাজনীতিকে ব্যাপক হারে পেশায় পরিণত করলে রাজনীতির নামে ব্যবসা চলে—আজ সারা দেশে যা চলছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরে নানা পেশার লোক যুক্ত(আছেন যারা রাজনীতিকে স্বীয় পেশার বাইরে রেখে ধর্মাচারণের মত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ধর্ম মন্দির মসজিদ অথবা অন্য কোনও উপাসনালয়ে আবদ্ধ থাকে না। ভগবানের উপাসনা ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র। ধর্ম আরও বৃহৎ এবং ব্যাপক। বিদ্যালয় মানেই যেমন জ্ঞান নয়, তেমনি উপাসনালয় অর্থই ধর্ম নয়। নিয়মিত বিদ্যালয়ে গিয়েও কেউ কেউ অশি(তই থাকেন, তেমনি নিয়মিত উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতিতে গিয়েও অনেক মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থকেন। 'যৎ ধৃতি ইতি ধর্মঃ।' যাহা ব্যক্তি(বা বস্তুর অস্তিত্ব ধারণ করে তাহাই ধর্ম। ধর্ম মানবতার সঠিক বিকাশের পথ। মনুষ্যত্বের বিকাশ, প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানব জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করে সমগ্র বি(ের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করাই ধর্মের ল(্য এবং এখানেই ধর্মের সার্থকতা। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হলেই রাজনীতিকে মানব কল্যাণের এবং ধর্মরাজ্য স্থাপনের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। তখনই রাজনীতি নীতিনিষ্ঠ হয়ে উঠতে বাধ্য।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে যে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই দলই আজকের বিজেপি-পূর্বসুরী। অতীতে পার্টির নীতির প্রতি আনুগত্য রেখে রাজস্থানে আটজন এম.এল.এ-র মধ্যে ছয়জনকে পার্টি বহিস্কার করেছিল। বিধানসভায় শক্তি(স্বার্থে দলীয় নীতিকে কোনত্র(মে বিসর্জন দেওয়া হয়নি। জনতা পার্টিতে থাকার সময় ঐক্যের নীতি ও সিদ্ধান্তের স্বার্থে শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রীত্ব ছাড়তে রাজী ছিলেন। দেশের প্রয়োজনে ১৯৭৭ সালে প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণের আবেদনে সাড়া দিয়ে

পার্টি বিনাশর্তে নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছিল। দুঃখের কথা জনতা পার্টির অন্য দলগুলির এই মনোভাব না থাকার ফলে দল ভেঙ্গে গিয়েছিল।

(মতার উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত যারা তাদের বি(দ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। সরকারী কাজে জনগণের কষ্টার্জিত ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করবার অভিযোগে আজ ভারতবর্ষের আকাশবাতাস মুখরিত। রাজনৈতিক দলগুলি এবং উচ্চপদবিশিষ্ট ব্যক্তি(রা যেভাবে অসত্য ভাষণে লিপ্ত হয়েছেন, এমন কি সংসদ ক(ও নির্ভেজাল অসত্য বাণী প্রচার করেছেন, তাতে শুধু (মতাসীন দলেরই নয় সমগ্র জাতির ভাবমূর্তি কলুষিত হচ্ছে। জনগণের মনোভাবকে উপে(া করে দলের কর্ণধাররা যে ভাবে দুর্নীতির অভিযোগগুলিকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করছেন, তার ফলে সমগ্র জাতির চরিত্রে কালিমা লেপন করা হচ্ছে। জনজীবনে নীতি নিষ্ঠার শেষ সম্বলটুকু হরণ করে ভারতবর্ষকে এক নীতিভ্রষ্ট দেশ হিসাবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চলছে। বিজেপি এর বি(দ্ধে গণচেতনা বৃদ্ধির প(কাজ করছে।

কেন্দ্রে বিজেপি-র দলীয় নেতৃবৃন্দের মন্ত্রীত্বকালে অথবা বিভিন্ন রাজ্যে দলীয় সরকার (মতায় থাকাকালে বিজেপির কোন নেতা অথবা কর্মীর বি(দ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। রাজ্য পরিচালনা যে জনগণের সেবা, বিজেপি একথা আপন কর্মমহিমায় প্রমাণ করেছে।